

# ମୂଢ଼ା ଆଠ-ଢାହମାନେଢ଼ ଗଢ଼ୀଢ଼େ

ତାଦାକ୍ଷୁରେ ମୂଢ଼ା ଆଠ-ରାହମାନ

ସୂଚକ : ଉଷାଦ ନୋମାନ ଆଲୀ ଖାନ

ଅନୁବାଦ : ନାକବାଂଲା ଡିମ୍ବ

ମୁଦ୍ରାଦାନା : ଆହମାଦ ଆଲ-ମାବା

ବୁକିଂଗ ମାଟରିଆଲ



## সূচি

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| সূরা ক্বামারের সাথে অপূর্ব মিল          | ৮  |
| সূরা ওয়াকিয়ার সাথে অপূর্ব ধারাবাহিকতা | ১৯ |
| সূরার শুরু                              | ২৬ |
| অতুলনীয় ভালোবাসা : 'রাহমাহ'            | ৩৪ |
| আল্লাহর কিতাবশিক্ষা : ভয় বনাম ভালোবাসা | ৪৪ |
| আল্লাহই কুরআন শেখান                     | ৫০ |
| ভয় ও দুঃখ : আল্লাহর ভালোবাসা           | ৫২ |
| সৃষ্টি ও সুপথ : ভুলোমন ও স্মরণিকা       | ৫৬ |
| বায়ান : সুস্পষ্ট পার্থক্য শেখানো       | ৬৩ |
| ভাষাবৈচিত্র্য                           | ৬৭ |
| দুই ধরণের নিদর্শন                       | ৭০ |
| তারা ও গাছের সিজদা                      | ৭৭ |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ভারসাম্য : নিদর্শন ও জীবন                  | ৭৮  |
| ন্যায়বিচার : বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য         | ৯৩  |
| বিনয়, কৃতজ্ঞতা, সম্মান                    | ১০১ |
| উপহার, বিস্ময়, সৌন্দর্য                   | ১০৭ |
| যোগাযোগের তিনটি প্রধান উপাদান              | ১০৯ |
| এতো পুনরাবৃত্তি কেন?                       | ১১২ |
| দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের রব                | ১২১ |
| জোড়া ও অদৃশ্য মহাশক্তি                    | ১২৪ |
| আল্লাহর শান : কেবল তিনিই পারেন, আর কেউ নয় | ১২৯ |
| সেদিন আমি নিজেকে ব্যস্তহীন করে ফেলবো       | ১৪২ |
| আজ চূড়ান্ত ভারসাম্যের দিন                 | ১৪৭ |
| হুজুত : অমুসলিম বনাম জাহান্নামী            | ১৫১ |
| জাহান্নামের ভয় ও দয়া                     | ১৫৬ |
| চিত্রময়ী জান্নাতের অপূর্ব রূপ             | ১৬০ |
| অপূর্ব বারাকাহ                             | ১৮৭ |



## সূরা ক্বামারের সাথে অপূর্ব মিল

সূরা আর-রাহমান ৫৫তম সূরা। এর আগের সূরাটি সুরাতুল ক্বামার। আর পরের সূরা সুরাতুল ওয়াকিয়া। এটা সুরাতুল ক্বামার আর সুরাতুল ওয়াকিয়ার মধ্যবর্তী সূরা।

এই ধারাবাহিকতাটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক সময়েই আমরা যখন কুরআন নিয়ে কথা বলি, আমরা এমনভাবে বলি যেন এটা কোনো কিতাব নয়। অথচ এটি একটি কিতাব। এটা কথা আকারে নাযিল হয়েছে। আর কথার ধারাবাহিকতা থাকে। কথা এলোমেলো হলে সেটা আর কথা থাকে না। তাই, অন্যান্য কিতাবের মতো এর সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে তসবিহ দানার মতো একে অপরের সাথে সংযুক্ত ও পরিপূরক অবস্থায় আছে!

এটি একটি বই। তাই এর সবকিছুই পরস্পর সংযুক্ত, একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তো আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে এই সূরাটি সুরাতুল ক্বামারের সাথে যুক্ত। খুব বিস্তারিত বলবো না। এরপর অল্প করে দেখাবো কীভাবে এই সূরাটি আবার পরের সূরা সুরাতুল ওয়াকিয়ার সাথেও যুক্ত। তাহলে আমরা বুঝতে পারব এই সূরাটির আশপাশের প্রতিবেশ কীরকম। এরপর ইনশাআল্লাহ আমরা সূরাটির অপূর্ব বর্ণনার ভেতরে প্রবেশ করবো।

সুরাতুল ক্বামারের ভেতর, একদম শুরুতে আল্লাহ বলেন,

اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتِرٌ

﴿কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা (অবিশ্বাসীরা) যদি কোনো নিদর্শন দেখে তাহলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে—“এ তো এক চিরাচরিত যাদু।﴾ [সূরা ক্বামার : ১-২]

নবীজি ﷺ-কে যে মুজিয়া দেয়া হয়েছিল তা হলো—তিনি চাঁদের দিকে ইশারা

করলেন আর চাঁদটি দু'ভাগ হয়ে গেলো। পুরো আরব অঞ্চল এটা প্রত্যক্ষ করেছিল।

এমনকি অনারব অঞ্চলগুলোর যেখানে তখন রাত ছিল তারাও এই ঘটনা দেখেছিল। তাই ইসলামিক বিবরণ ছাড়াও অন্যস্থানেরও এই ঘটনা সম্পর্কে বিবরণও আছে। এই ঘটনা সম্পর্কে পার্সিয়ান বিবরণও আছে। বাহিরের অঞ্চলের বিবরণও আছে এটা নিয়ে। যাইহোক, কুরাইশরা এটা দেখলো। এরা ছিল নবী ﷺ এর আশপাশের মানুষই। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেয়া চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া এই মুজিয়া প্রত্যক্ষ করেছিল। আল্লাহ এটা কীভাবে বর্ণনা করেন? আল্লাহ বলেন,

اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

(সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।)

কীসের সময়? কী নিয়ে বলা হচ্ছে?—বিচারদিবস। কেন জানেন? কারণ আল্লাহর এমন অনেক অলৌকিক ঘটনাগুলো (মুজিয়া) আগেও দেওয়া হয়েছিল, যেমন আল্লাহ মুসা ﷺ-কেও মুজিয়া দিয়েছিলেন। ঈসা ﷺ-কেও মুজিয়া দিয়েছিলেন। তাই এটাই প্রথম অলৌকিক ঘটনা না! চাঁদ দ্বিখণ্ডনের এই মুজিয়া দেয়া হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ শেষ জামানার হওয়ায় বিচারদিবসের সবচাইতে নিকটবর্তী। তাই তাঁকে যখন কোনো মুজিয়া দেয়া হলো, তখন আপনি বুঝে নিবেন যে অন্য যেকোনো নবীর চাইতে সেই সময় সবচাইতে নিকটে চলে এসেছে।

হাদীসে এজন্যই তিনি বলেন, “আমি আর সেই সময় হলো যেন পাশাপাশি দুটো আগুুল।” পাশাপাশি দুটো আগুুল ধরুন। বিচারদিবসের এতোটাই নিকটবর্তী নবীজি ﷺ।

এখন, নবী ﷺ-কে চন্দের দ্বিখণ্ডিত হওয়া মুজিয়া দেয়া হলো। আল্লাহ এটাই উল্লেখ করে বলছেন বিচারদিবসের সময়ও খুব কাছে চলে এসেছে। তিনি আরও বলেন, তিনি অবিশ্বাসীদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আগেই জানতেন। তিনি বলেন,

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا

(তারা যদি সম্ভাব্য সমস্ত মুজিয়াও দেখতো, তবুও তারা উপেক্ষা করতো।)

চাঁদের দুভাগ হওয়া ভুলে যান, যদি আল্লাহ দুনিয়াটাও দু'ভাগ করে দেখাতেন তবুও তারা পান্না দিতো না। তখনও তারা উপেক্ষাই করতো।

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

﴿তারা বলতো, এটা তো দেখি পূর্ব থেকে চলে আসা চিরাচরিত জাদু!﴾

কীভাবে সে করলো! এটা কী ধরনের জাদু?

এটাকে তারা ঈমান বলতো না, ‘জাদু’ বলতো। এখন পার্থক্যটা কী?

এখানকার প্রত্যেকটি শব্দ ভালোভাবে বুঝতে হবে। ‘জাদু’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় যখন আপনি কোনোকিছুকে কমনসেন্স (সাধারণ যৌক্তিক বিচারবুদ্ধি) দিয়ে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করতে না পারেন।

**জাদুকে বিশ্বাস করা একরকম অদৃশ্যকে বিশ্বাস করার মতোই।** কারণ কাউকে বাতাসে ভাসতে দেখে, জাদু করতে দেখে যদি আপনি বলেন,

“আমার কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, না আছে কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা। এখানে রহস্যময় কিছু একটা হচ্ছে। আমি জানি না এটা কী।”

তাই যখন আপনি কোনো কিছুকে জাদু বলছেন, এটা একপ্রকার ঈমান বিল গাইব হয়ে যাচ্ছে, অদৃশ্যে বিশ্বাসের মতোই হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ভুল ধরনের অদৃশ্যে বিশ্বাস, কিন্তু অন্ততপক্ষে কোনো একপ্রকার অদৃশ্যে বিশ্বাস তো!

তাই আল্লাহ এখানে যা বলছেন তা হলো, যদিও তারা মেনে নিচ্ছে এখানে কোনো বাহ্যিক শক্তি চলমান আছে, তবুও সেটার কৃতিত্ব তারা আল্লাহকে দিবে না।

এখানে এই কথাটিই বলা হচ্ছে। এমনকি যখন চাঁদটিও দুখণ্ড হয়ে গেলো, তারা একে কী বলছে?

—জাদু।

তারা মানতেই পারছে না এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। এটা মানতেই পারে

না।

এছাড়াও, এটাকে জাদু বলা মানে যা আমি বললাম “প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করা (Leap of Faith)!” আগেই চলে গিয়েছেন। যদি আপনি বলেন, “আমি শুধু দেখেই বিশ্বাস করবো, কমনসেন্সে সেটা আমাকে বুঝতে হবে।” যদি কমনসেন্স নিয়েই কথা বলতে হয়, তবে জাদু বলা উচিত নয় আপনার।

তাই তারা কমনসেন্স ছাড়লেও ঈমান গ্রহণ করবেই না। দুটোই অদৃশ্য। তারা জাদুতে ঈমান এনেছে, কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনবে না। এতোটাই গোঁয়ার হয়ে গিয়েছিল তারা।

এরও পূর্বে, পূর্ববর্তী জাতিরাও একই ভুল করেছিল। নবীরা তাদের মুজিয়া দেখাতো, তবুও তারা মানতো না। তারাও সেটাকে জাদু বলতো। তো কাফির-মুশরিকরা এই ভুল বারবার করে এসেছে! এটা তো পুরো বিশ্বের ইতিহাস, সমস্ত নবীর জাতিদের ইতিহাস! একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে কুরাইশরা।

এখন, এগুলো কোন সূরার শুরুতে আছে?

—সুরাতুল ক্বামার।

নবী ﷺ-কে চন্দ্র বিদীর্ণকরণ একটি মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে এর চাইতেও অনেক বড় কিছু দেয়া হয়েছিল। সেই মুজিয়া চন্দ্র বিদীর্ণকরণের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী কিছু। কী সেটা?

—আল-কুরআন!

নবীজি ﷺ-কে একাধিক মুজিয়া দেয়া হয়েছে। এর মাঝে ছোট একটি মুজিয়া চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া। আর বড় মুজিয়াটি “আল-কুরআন”।

সুরাতুল ক্বামার ছোট মুজিয়া দিয়ে শুরু হয়েছে। এবার সুরাতুর রাহমান শুরু হচ্ছে বড় মুজিয়া দিয়ে। الرَّحْمٰنُ, عَلَّمَ الْقُرْآنَ (দয়াময় (আল্লাহ), তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।) বড় মুজিয়া। এই দুটোর মধ্যকার একটা সম্পর্ক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।



এখন, আরেকটি সম্পর্ক আছে। খুব মনোযোগ দিবেন এখানে। অন্য সম্পর্কটি হলো—যখন আল্লাহ কোনো মুজিয়া দেন, আর মানুষ সেই মুজিয়া অস্বীকার করে, তখন সেই জাতিকে শাস্তি দেয়া হয়। মুজিয়া হচ্ছে চূড়ান্ত বিশ্বাসের অংশ, যেখানে আর কোনো অবিশ্বাসের সুযোগ থাকে না। কারণ কোনো মানুষের পক্ষে মুজিয়া বা এমন বড় অলৌকিক কিছু দেখানো অসম্ভব। ফলে, এরপরেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে সৎ পথে না চললে শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।

যখন আল্লাহ উটনিটিকে সালিহ ؑ এর জাতির প্রতি পাঠালেন আর তারা অস্বীকার করে বসলো, তখন তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যখন আল্লাহ ؑ মুসা ؑ-কে লাঠি আর নয়টি নিদর্শনসহ পাঠালেন। ফেরাউনের জাতি সেগুলো অস্বীকার করে বসলো, ফেরাউন আর তার জাতি তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

যখন আল্লাহ কোনো মুজিয়া পাঠান সেটাই তখন চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। সেটা যদি অস্বীকার করেন, আপনি শেষ।

খুব ভালো করে খেয়াল করুন, বার্তা আর মুজিয়ার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। দুটো ভিন্ন জিনিস।

প্রত্যেক নবীর একটি বার্তা আছে, আবার প্রত্যেক নবীর একটি মুজিয়াও আছে। সেই নবী আল্লাহর বার্তা অনেক অনেক বছর যাবৎ দাওয়াত হিসেবে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তাতে সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন না।

কিন্তু যখন নবীকে কোনো মুজিয়া দেয়া হয়, আর ঐ জাতির লোকেরা বলে—আমাদের কিছু যায় আসে না, এটা জাদু, এটা চালাকি, মিথ্যা জিনিস, তখন সেই জাতিকে ধ্বংস করা হয়।

আপনাদের একটি কঠিন প্রশ্ন করি।

রাসুলুল্লাহ ؑ এর আগে কোন নবীকে পাঠানো হয়েছিল?

—ঈসা ؑ।

ঈসা ؑ-কে কি মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ! তাঁকেও মুজিয়া দেয়া হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে শুধু একটি জিনিস বলি। তিনি তাঁকে বিশ্বাস করা অল্প কয়েকজন লোকের সাথে ছিলেন। তাদেরকে ‘আল হাউয়ারিয়ুন’ বলা হতো। অল্প কজন মানুষ আর তারা বড় বিপদে আছে। কারণ বনি ইসরাইলরা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে রোমান সাম্রাজ্যের কাছে। তাদের এখন আসামী হিসেবে মনে করা হচ্ছে। তাই তাদের হত্যা করা হবে। তো তারা ভয়ে আছেন। আল-হাউয়ারিয়ুন, যারা ইসা ﷺ এর সাহাবা, তারা ভয় পাচ্ছেন।

তো ভয় পাওয়ার কারণে, তারা যেন ভালো বোধ করনে, সেজন্য তারা নবীকে বললেন, “আপনি কি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন? مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ (তিনি যেন আসমান থেকে এক টেবিল খাদ্য পাঠান।) [সূরা মায়িদা : ১১৪] এটা তো মুজিয়া।

বনি ইসরাইলরা আগেও অনেকবার মুজিয়া দেখেছে।

তাতে কি কাজ হয়েছে?

—না।

ইনি বনি ইসরাইলের কাছে পাঠানো সর্বশেষ নবী। কারণ পরের নবীই রাসুলুল্লাহ ﷺ। তিনি সমস্ত মানবজাতির প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূল। তো, অল্প কয়েকজনই সত্যিকার অর্থে ঈসা ﷺ-কে বিশ্বাস করে। এখন তাঁরা কী চাচ্ছেন? বার্তা নাকি মুজিয়া?

—তাঁরা মুজিয়া চাচ্ছেন।

ঈসা ﷺ বললেন, আল্লাহকে ভয় করো! তোমরা জানো না কী চাচ্ছে! আল্লাহ ﷻ উত্তর দিলেন, اِنِّیْ مُنْزِلُهَا عَلَیْكُمْ

(তোমাদের তা পাঠাচ্ছি।) [সূরা মায়িদা : ১১৫]

কিন্তু যদি এরপরে তোমরা অবিশ্বাস করো,

فَاِنِّیْ اُعْذِبُهُ عَذَابًا لَّا اُعْذِبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ

(তাহলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যেই শাস্তি আমি না কোনো জাতিকে, না কোনো প্রজন্মে, এমনকি পুরো মানবজাতির ইতিহাসে কখনোই কাউকে দেইনি।)

পুরো কুরআনে আজাব সম্পর্কে এই আয়াতের চাইতে রাগান্বিত আয়াত আর কোথাও নেই। শাস্তি নিয়ে এই আয়াতের চাইতে বড় কোনো আয়াতই নেই। কেন আল্লাহ এতো রেগে গেলেন?

কারণ আল্লাহ খুবই রাগ করেন যখন আপনি মুজিয়া অস্বীকার করেন। এটা যেনযেন কোনো বিষয় না। বনি ইসরাইলকে অনেক অনেক মুজিয়া দেয়া হয়েছিল। তাই তাদের তো দায়িত্ববোধ বেশি থাকার কথা। এজন্যই এই আয়াত এসেছিল। এটা খুবই ভয়ানক অপরাধ হয়ে যাবে।

চলুন ফিরে আসি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে। আমরা বলেছিলাম রাসুল ﷺ দুটো মুজিয়া পেলেন। একটা ছোট, আরেকটা বড়। ছোটটা চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া, বড়টা আল-কুরআন।

কিন্তু এখানে পার্থক্য আছে। চলুন কুরআন নিয়ে কথা বলি। কারণ এটিই নবী ﷺ এর প্রধান মুজিয়া।

অন্যান্য নবীকেও কিছু কিছু মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল।

মুসা ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে লাঠি পেয়েছিলেন যা সাপ হয়ে যেতো।

আল্লাহর ইচ্ছায়, ঈসা ﷺ অসুস্থকে সুস্থ করে দিতে দিতেন। কাঁদা নিয়ে পাখির মূর্তি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা জীবিত পাখি হয়ে ওড়ে যেতো।

এগুলো ভালো উদাহরণ। তখন যদি আমাদের ভিডিও ক্যামেরা থাকতো, তাহলে এসব মুজিয়া ইউটিউবে পেতাম। কিন্তু আমাদের তখন ক্যামেরা ছিল না। তাই আমরা এসব মুজিয়া আর দেখি না, সেগুলোর ব্যাপারে শুধু শুনি।

এখন ভাবুন তো, চোখে মুজিয়া দেখা আর মুজিয়া সম্পর্কে কানে শোনা, দুটো কি কখনো সমান হবে?

কেউ যদি কোনো লাঠিকে সাপে পরিণত হতে দেখে...এরপর তাঁরা বুড়ো হবার পর তাদের নাতি-নাতনিদের বলে—“জানো? আমরা একটি লাঠি দেখেছিলাম। সাপ হয়ে গিয়েছিলও!”

সেই বাচ্চা বলবে, “দাদা! তুমি এই গল্প আমাদের পঞ্চাশবার বলেছো! অন্য কোনো গল্প বলো!”

যে এটা দেখেছিল সে তৎক্ষণাৎ চমকে গিয়েছিল! প্রায় হার্টঅ্যাটাকের মতো চমকে গিয়েছিল! অথচ যে শুনেছে, সে বিশ্বাস করেছে কিন্তু অবাক হয়নি। কেন জানেন? কারণ যারা দেখেছিল, তাদের কাছে এটা মহাবিস্ময়কর ঘটনা ছিল, সেরকমটি আর কখনো দেখেনি। আর যারা এটা শুনেছে, তাদের কাছে তা শুধুই একটি বার্তা, গল্পের মতো বর্ণনা।

আপনাদের দুটো জিনিস বলেছিলাম। একটি বার্তা আর অন্যটি অলৌকিকতা (মুজিয়া)। যেসব মানুষ পরে এসেছে তাদের কাছে এটা আর অলৌকিক (মুজিয়া) নয়, এটা শুধুই একটি বার্তা। আর বার্তার বিষয় হলো আপনাকে শুধু বিশ্বাস করতে হবে। আর অলৌকিকতার ক্ষেত্রে যে লোক দেখবে তাকে বলতেই হবে, এমনকি ঈমান না আনলেও তাদের বলতে হবে “এটা তো জাদু!” তাদের কোনো অবাক করা কিছু বলতেই হবে। কিন্তু বার্তার ব্যাপারে আপনি বিশ্বাস করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন।

তো নবীজি ﷺ এর সমস্ত মুজিয়ার ক্ষেত্রে, যেসব মানুষ তখন জীবিত ছিল কেবল তারাই মুজিয়া দেখতে পেরেছে। এমনকি তাদের নিজেদের সন্তানদের বেলায়ও এগুলো মুজিয়া ছিল না। এগুলো তখন শুধুই বার্তা। পার্থক্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

তার ক্ষেত্রে, কোন মুজিয়াটি সবচাইতে বড় মুজিয়া?

—আল-কুরআন।

অন্যান্য মুজিয়ার মতো কুরআনের অলৌকিক মুজিয়া কি দেখা যায়?

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا

(বল, “আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, একদল জ্বিন কান পেতে (কুরআন) শুনেছে আর বলেছে, “আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।)।

[সূরা জ্বীন : ১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ

(হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন।) [সূরা হাজ্জ : ৭৩]

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

(তারা বলেছে, “আমরা **শুনেছি** ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! তোমার ক্ষমা (প্রার্থনা করি), তোমারই কাছে (সকলের) প্রত্যাবর্তন।”) [সূরা বাকারা ২৮৫]

يَسْمِعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ

(সে আল্লাহর আয়াতসমূহের তেলাওয়াত **শোনে...**) [সূরা জাসিয়াহ : ৮]

বারবার বারবার কুরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেই যাচ্ছেন যে কুরআন দেখা হয় না, কুরআন শোনা হয়! শুধু বার্তাবাহকে দেখা হয়।

এর আগের প্রত্যেকটি মুজিয়া ছিল চোখের জন্যে। এবারই প্রথম মুজিয়া পাঠানো হলো যা কানে শোনার জন্যে। এমনটা আগে কখনো হয়নি। কখনোই না। পূর্বের প্রতিটি মুজিয়া ছিল চোখে দেখার জন্যে।

এখন, নবীজিকে কয়টি জিনিস দেয়া হয়েছিল? দুটো জিনিস। একটি বার্তা, আরেকটি মুজিয়া। নবীদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বার্তা আর মুজিয়া দুটো একই জিনিস। রাসূল ﷺ এর বার্তাটি আল-কুরআন আবার মুজিয়াটিও আল-কুরআন। দুটোই এক। এর আগে কখনো এমন হয়নি। দুটো সবসময়ই আলাদা ছিল।

সালেহ ﷺ এর বার্তা ছিল একটি। আর তাঁর মুজিয়া ছিল অন্যটি, সেটা উট। উটটি বার্তা ছিল না, শুধুই মুজিয়া ছিল। মুসা ﷺ এর বার্তা ছিল একটি জিনিস, আর তাঁর মুজিয়া ছিল সেই লাঠিটি। লাঠিটি বার্তা ছিল না, এটা শুধু মুজিয়া ছিল!

কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আল-কুরআনই বার্তা, আবার আল-কুরআনই মুজিয়া। এমনটি আগে কখনো হয়নি।

তাই এটা একটু জটিল বিষয়, একটু ভিন্নতর। কারণ যদি এটা মুজিয়াই হয়, তবে মুজিয়া অস্বীকার করলে কী হয়? যে জাতিই মুজিয়া অস্বীকার করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ ﷻ সুরাতুল ক্বামারে বারবার বারবার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের কথা বলছেন। কারণ তারা মুজিয়া অস্বীকার করেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

(এদের পূর্বে নূহ-এর জাতিও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা আমার বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং বলেছিল : এতো এক পাগল। আর তাকে ভয় দেখান হয়েছিল।) [সূরা ক্বামার : ৯]

فَدَعَا رَبِّي أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

(সে তার প্রভুকে ডেকে বলল, “আমি তো পরাস্ত; তাই আমাকে সাহায্য কর।”)

[সূরা ক্বামার : ১০]

বারবার বারবার! এক নবী। এরপর আরেক নবী! এরপর আরেক নবী। তাদেরকে নবীদের মাধ্যমে মুযিজা ও নিদর্শন পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা সেসব মুযিজা ও নিদর্শন অস্বীকার করল। ফলে তাদের জাতি ধ্বংস হচ্ছে! নিদর্শন ও মুযিজাপ্রাপ্ত লোকেদের অস্বীকার করার কারণে তাদের ধ্বংসের পর আল্লাহ ১৭ নং আয়াতে বলছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

(আমি কুরআন সহজ করেছি যেন তোমরা বার্তা হিসেবে মনে রাখতে পারো।)

কারণ যখন কুরআন মনে রাখা সহজ বলবেন, তখন আপনি মুজিমার কথা বলছেন না, বার্তার কথা বলছেন। বার্তা মনে রাখতে হয়। পুনরুল্লেখ করতে হয়।

এই বার্তার সুবিধা নাও! এই বার্তাটির সুযোগ গ্রহণ করো!

তাই আল্লাহ কুরআনের বার্তাকে সূরা আল-ক্বামারের বড় করে দেখাচ্ছেন।

কুরআনের অন্য দিকটি কী?—মুজিয়া।

যদি কুরআন মুজিয়াও হয়, আর কুরাইশ তা অস্বীকার করে, তাহলে তাদের সাথে সাথে কী হওয়ার কথা?

—ধ্বংস।

কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি বেশি বেশি করুণা করেছেন, যেমনটা আগে কখনোই করেননি। তাই যদিও তিনি তাদের কুরআন (মুজিয়া) দিয়েছেন, তবুও তাদের ধ্বংস করেননি। মুযিজাকে আল্লাহ রহমত (দয়া) হিসেবে নাযিল করেছেন শিক্ষা

الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ

তিনি বলেননি ‘আল্লাহ, যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন’ (আল্লাহ আল্লামাল কুরআন)। তিনি বলেননি ‘সৃষ্টিকর্তা, যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন’ (আল খালিক আল্লামাল কুরআন)। তিনি বলেছেন ‘আর-রাহমান আল্লামাল কুরআন’ (দয়াময় আল্লাহ, কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন)।

এটা যদি অন্য কোনো মুজিয়া হতো, অন্য কোনো নবী হতো তবে তোমরা ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে যেতে। ইতিমধ্যে মরে কবরে চলে যেতে। যেহেতু তিনি আর-রাহমান (প্রচন্ড দয়াশীল), যিনি বার্তা আর মুজিয়া একসাথেই দিয়েছেন, তাই তিনি এখনো তোমাদের ধ্বংস করেননি। তিনি এখনো তোমাদের সুযোগ দিচ্ছেন। এটা আল্লাহর দয়া।

আশা করি, সূরা দুটোর মধ্যকার সম্পর্ক এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন।





## সূরা ওয়াকিয়াহর সাথে অপর ধারাবাহিকতা

এখানে সূরা আর-রাহমান ও পরের সূরা সূরাতুল ওয়াকিয়াহর সাথে ধারাবাহিক অপর মিলের বিষয়টি দেখব।

❁ সূরাতুল ওয়াকিয়াহটি একটু বড় সূরা। এই সূরার শুরুতে দেখবেন জান্নাতে যাওয়া কিছু মানুষের কথা বলা আছে:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ—أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ—فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ—ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ—وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ

{অগ্রগামীরা অগ্রগামীই থাকবে।} (অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা ঈমানের কাফেলায় অগ্রগামী, আখেরাতেও তারা জান্নাতে অগ্রগামী হবে।)

{তারাই (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (হবে),

{সুখের জান্নাতে (থাকবে)}.

{(এদের মধ্যে) বড় একদল পূর্ববর্তীদের থেকে}

{আর অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের থেকে।} [সূরা ওয়াকিয়াহ : ১০-১৪]

একদম সর্বপ্রথম, সামনের VIP সিটে বসা লোক যেগুলো জান্নাতে যাবে; ইনারাই সূরাতুল ওয়াকিয়াহর আলোচ্য মানুষগুলোর অন্যতম। আচ্ছা, এই সর্বপ্রথম অগ্রগামী দলে নবীগণ ছাড়া আর কারা?

—সাহাব। কিন্তু সেটা তাদের যুগের জন্য।

আল্লাহ বলছেন, وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ, আর অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের থেকে—কেন জানেন? প্রত্যেক প্রজন্মেই তাদের নিজস্ব ‘সাবিকুন’ আছে। ২০১৫ সালের নিজস্ব ‘সাবিকুন’ আছে। ২০২৪ সালেরও নিজস্ব ‘সাবিকুন’ থাকবে। ২০৫৫ সালেও যদি আল্লাহ ততদিনে কেয়ামত না আনেন, তখন সেকালেরও নিজস্ব ‘সাবিকুন’ থাকবে। এখনো শেষ না কিন্তু। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ‘সাবিকুন’

থাকবে।

শুধু পার্থক্যটি হলো, প্রথম যুগের সাবিকুনদের অনুপাত বা শতকরা হার বেশি ছিল। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কল্পনা করুন, আটশজন মানুষ একটি পরীক্ষা দেয়। যদি সাহাবীদের সময়ে ঈমানের এই পরীক্ষা আটশজন মানুষ দেয়, তবে সাতশ পঞ্চাশ জনই ৯০% এর অধিক নম্বর পাবে। তো তাঁরা গোল্ডেন এ প্লাস।

কিন্তু পরে অন্যান্য প্রজন্ম যেতে যেতে তখনও মানুষ ৯০ এর বেশি পাবে, তবে শতকরা হার নেমে যাচ্ছে। ধরুন, সাহাবাদের ৮০০ জনে ৭৫০ জন ৯০ এর বেশি পেয়েছে, আর পরের প্রজন্মের ১৮০০ জনে ৭৫০ জন ৯০ এর বেশি পেয়েছে।

তাই **قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ** পরবর্তীদের মধ্যে আরও কম। কম মানুষ না কিন্তু, শতকরা হার কেবল কম। সাহাবীদের সময়ে এ প্লাসের হার বেশি। তাই সামগ্রিক গুণ অনেক অনেক বেশি। আমাদের প্রতিযোগিতা কম, তাই সামগ্রিক গুণ অনেক কম। এটাই পার্থক্য। তবে প্রতিযোগিতা প্রত্যেক প্রজন্মেই থাকে।

তো, সুরাতুল ওয়াকিয়ার প্রথম বিষয় ‘আস-সাবিকুন’।

❁ এই সূরার দ্বিতীয় বিষয় ডানপাশের লোকজন।

**فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ**

(ডান পাশের মানুষজন।) [সূরা ওয়াকিয়াহ : ২৭] আস-সাবিকুনদের সাথে ডান পাশের মানুষের পার্থক্য কী? সাবিকুনদের বলতে পারেন সংরক্ষিত, এক্সক্লুসিভ, ফার্স্ট ক্লাস মানুষ। এরা সর্বোচ্চ জাহান্নাতের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাস্থিত লোক। আর ডান পাশের যেই মানুষজন বাকি সকলে, জাহান্নাতের ইকনমি ক্লাস। আল্লাহ আমাদের সাবিকুনদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

কিন্তু অন্ততপক্ষে ডান পাশের মানুষ হিসেবে থাকা মানে তাঁরা জাহান্নামে যাবে না। এরাও জাহান্নাতে যাবে। এটা সূরার দ্বিতীয় বিষয়। [আয়াত : ২৭-৪০]

❁ এখন, অন্যদিকে কারা আছে? একদিকে ডানপাশে মানুষ আছে, আবার বামপাশেও মানুষ আছে। এরপর আল্লাহ বামপাশের মানুষদের নিয়ে বলছেন [আয়াত ৪১-৫৭]। তিন ধরনের মানুষ পেলাম এখন পর্যন্ত। প্রথমে অভিজাত শ্রেণী, ফার্স্ট ক্লাস। এরপর ডানপাশের মানুষ। এরপর বামপাশের মানুষজন।

✽ এরপর চতুর্থ বিষয়। এখন আল্লাহ কিছু প্রশ্ন করছেন।

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُنْبُونَ

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

তিনি এসব অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন!

{তোমরা কি বাচ্চা সৃষ্টি করো? নাকি আমরা করি?}

{তোমরা ফসল ফলাও নাকি ফলাই?}

{তোমরা আগুন জ্বালাও নাকি আমরা জ্বালাই?}

{তোমরা আকাশ থেকে পানি নামাও নাকি আমরা নামাই?} [আয়াত : ৫৮- ৭৪]

মানে আল্লাহ ﷻ মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন তা চিন্তা করতে বলছেন; এসব আল্লাহ সৃষ্টি করেন, তোমরা কিছুই সৃষ্টি করো না। তোমাদের কোনো সৃষ্টিশীলতা নেই। আল্লাহর সৃষ্টি এই সূরার চতুর্থ বিষয়।

✽ এবার পঞ্চম বিষয়।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

{আমি তারকাদের পতনস্থলসমূহের (অস্তাচলসমূহের) শপথ করছি),

{আর এটা একটা বড় শপথ, যদি তোমরা জানতে!}

{(এই মর্মে) যে, নিশ্চয়ই এ এক সম্মানিত কুরআন};

{(যা আছে) এক সুরক্ষিত গ্রন্থে (লাওহে মাহফুযে)}

{যারা পাক-পবিত্র তারা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।}

{(এ কুরআন) বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।} [আয়াত : ৭৫-৮০]

উফ! এই বিষয়টি কুরআনের বিশেষত্ব ও মহিমা সম্পর্কিত। কুরআনের অসাধারণ গুণ ও অসাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে কথা হচ্ছে এখানে। এটা কিন্তু ছোট কোনো ব্যাপার না।

এই হলো সূরা ওয়াকিয়ার প্রধান পাঁচটি বিষয়। সূরার শেষটি আবার পুরোটা সংক্ষেপে বলে দেয়। কিন্তু এগুলোই প্রধান পাঁচটি বিষয়।

[১] সাবিকুন! অগ্রগামী দল।

[২] আসহাবুন ইয়ামিন। ডানদিকের দল।

[৩] আসহাবুন শিমান। বামপাশের মানুষজন।

[৪] আল্লাহর সৃষ্টি। শুধুমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করেন।

[৫] কুরআনের বিশেষত্ব ও মহিমা সম্পর্কিত।



সুরাতুর রাহমান আমরা পড়ার ও বোঝার চেষ্টা করছি এখানে। তাহলে চলুন, সূরা ওয়াকিয়ার সাথে এই সূরা আর-রাহমানের সম্পর্ক কী সেটা জানি।

[১] সূরা আর-রাহমানের প্রথম বিষয় কী?

الرَّحْمٰنُ —عَلَّمَ الْقُرْءَانَ

প্রথম বিষয়টি কুরআন।

সুরাতুল ওয়াকিয়াতে কুরআন বিষয়টা কতো নাম্বারে এসেছে?

—শেষে, পাঁচ নাম্বারে।

তাহলে সূরা আর-রাহমানে এটা প্রথম বিষয় আর সূরা ওয়াকিয়াতে পঞ্চম বিষয়।

[২] সুরাতুর রাহমানের দ্বিতীয় বিষয় আল্লাহর সৃষ্টিরা।

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

সুরাতুল ওয়াকিয়ার চতুর্থ বিষয় কোনটি ছিল?

—আল্লাহর সৃষ্টি!

[৩] সুরাতুর রাহমানের তৃতীয় বিষয় বিচারদিবস; কীভাবে পাপীরা বিপদে পড়বে আর জাহান্নামে চলে যাবে। বিচারদিবস আর জাহান্নামের আগুন সুরাতুর রাহমানে তিন নম্বর বিষয়।

সুরাতুল ওয়াকিয়াতে তিন নম্বর বিষয় কী ছিল?

—বামদিকের মানুষ। যারা বিচারদিবসে দাঁড়িয়ে শেষমেশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

সম্পর্কটা দেখতে পাচ্ছেন?

[৪] সুরাতুর রাহমানের চতুর্থ বিষয় জান্নাত।

وَلَمَن حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

(আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত।)

আচ্ছা। অন্তত আপনি আল্লাহকে ভয় করেছেন। আপনি সবচাইতে ভালো ছিলেন না ঠিক আছে, তবে অন্তত তাঁকে ভয় তো করেছেন!

সুরাতুল ওয়াকিয়াতে দ্বিতীয় বিষয় ডানপাশের মানুষজন; যারা অন্তত আল্লাহকে ভয় তো করেছে। তাই জান্নাতে চলে যাবে।

[৫] সুরাতুর রাহমানের শেষ বিষয় হচ্ছে অসাধারণ, সুপার স্পেশাল, ডিলাক্স প্যাকেজের জাম্নাত, এলিট শ্রেণীর লোকেদের জাম্নাত। এটা সবচাইতে সুন্দর وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ অনন্য এক জাম্নাত! আলাদা স্পেশাল জাম্নাত! এর মধ্যে আরও অসাধারণ অনিন্দ জিনিসপাতি আছে!

তো একটা জাম্নাত। আবার অন্য একপ্রকার জাম্নাত!

এটাই শেষ বিষয়। স্পেশাল জাম্নাত।

সুরাতুল ওয়াকিয়ার প্রথম বিষয় ছিল সাবিকুনাস সাবিকুন। তারা কোথায় যাবে?

—জাম্নাতের সেই স্পেশাল জায়গায়!

সুরাতুর রাহমানের পাঁচটি বিষয়! আর সুরাতুল ওয়াকিয়ার পাঁচটি বিষয়।

#### সূরা আর-রাহমান ও সূরা ওয়াকিয়ার বিস্ময়কর মিল

##### ৫৫.(মাদানী) সূরা আর রহমান এর বিষয়বস্তু

১. কুরআনের মাহাত্ম্য ও বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা। আয়াত [১-৪]

২. আল্লাহর সৃষ্টি (যেমন-সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মতো চলে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত অবস্থায় আছে।) আয়াত [৫-৩৪]

৩. বিচার দিবস এবং অপরাধীদেরকে কিভাবে জাহান্নামের নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ এরা বাম দিকের দল। আয়াত [৩৫-৩৭]

৪. ২য় শ্রেণীর জাম্নাতী (অর্থাৎ এরা ঈমানদারদের সর্বশ্রেষ্ঠ দল নয় এরা শুধু আল্লাহকে ভয় করতো তাই এরা দুটি জাম্নাত পাবে।) আয়াত [৪৬-৬১]

৫. জাম্নাতের সুপার স্পেশাল দল আয়াত [৬২-৭৮]

##### ৫৬.(মাক্কী) সূরা ওয়াকিয়া এর বিষয়বস্তু

১. সাবিকুন (জাম্নাতের অগ্রগামী দল) আয়াত [১-২৬]

২. আসহাবুল ইয়ামিন (তারা হবে ২য় শ্রেণীর জাম্নাতী অর্থাৎ ডান দিকের দল।) আয়াত [২৭-৪০]

৩. আসহাবুস শিমাল (বাম দিকের দল যারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী) আয়াত [৪১-৫৬]

৪. আল্লাহর সৃষ্টি। (এখানে আল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। যেমন, মানুষ সৃষ্টি, আত্মন সৃষ্টি। এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে এসব বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন যে এসব মানুষ সৃষ্টি করে না। মানুষের সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা নেই।) আয়াত [৫৭-৭৪]

৫. কুরআনের মাহাত্ম্য ও বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা। আয়াত [৭৫-৯৬]